প্রজ্ঞায় যাঁর উজালা জগৎ

নবিজির প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার গল্প

সাব্বির জাদিদ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

নবিজির মাক্কি জীবনের প্রজ্ঞা	১১
নবুয়তের আগের প্রজ্ঞা	২৫
হিজরতের কলাকৌশল	২৯
নবিজির রাজনৈতিক প্রজ্ঞা	৩৫
নবিজির রণকৌশল	৫৬
শিক্ষা প্রদানে নবিজির প্রজ্ঞা	৯২
নসিহা প্রদানে নবিজির বুদ্ধিমত্তা	১০৬
নবিজির বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা	১২৩
নবিজির সাংসারিক বুদ্ধিমত্তা	১৩৫
ভুল সংশোধনে নবিজির বুদ্ধিমত্তা	১৪৮
একগুচ্ছ উপমার ঝলক	১৫১
নবিজির সমাজচিন্তা	১৫৬

নবিজির মাক্কি জীবনের প্রজ্ঞা

এক

সন্দেহ নেই, নবিজির নবুয়তপরবর্তী মক্কার জীবন ছিল সবচেয়ে কঠিন, দুর্বিষহ এবং বিপদসংকুল। রিসালাতের দায়িত্ব পাওয়ার আগে যে মানুষটি ছিলেন সবার চোখের মণি, স্নেহধন্য, আল আমিন; নবুয়তপ্রাপ্তির পর সেই মানুষটি হয়ে ওঠেন মক্কার নেতৃস্থানীয়দের প্রধান শত্রু। মক্কার এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়েও নবিজি এক মুহূর্তের জন্য খেই হারাননি, বিচলিত হননি, দমে যাননি; বরং প্রতিটি আপদকালে তিনি এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছেন, যা তাঁর অসামান্য মেধা ও বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ বহন করে।

নবুয়তের প্রথম তিন বছরের ইসলাম ছিল গোপনীয়, অপ্রকাশ্য। এই তিন বছরে দ্বীনের দাওয়াত চলেছে গোপনে, শিশির ঝরার মতো নিঃশব্দে, কাফিরদের চোখের আড়ালে। তৃতীয় বছরে প্রকাশ্যে দ্বীন প্রচারের আদেশ এলো আল্লাহর তরফ থেকে। আল্লাহ বললেন, তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে ঘোষণা দাও আর মুশরিকদের উপেক্ষা করো। তিনি আরও বললেন, তুমি তোমার পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের ভীতি প্রদর্শন করো।

নবিজির কাছে এই ঐশী আদেশ যখন এলো, নবিজির অনুসারী তখন অল্প কিছু দুর্বল-দরিদ্র মুসলমান। প্রকাশ্যে আসার আগে এই পার্থিব শক্তির স্বল্পতায় অন্য কেউ হলে এক মুহূর্ত ভাবত, কিন্তু নবিজি ভাবলেন না। তিনি জানতেন, কী তাঁকে করতে হবে। প্রথমে তিনি নিকটাত্মীয়, অর্থাৎ বনু আবদুল মুত্তালিবকে নিজের দলভুক্ত করতে চাইলেন। তবে দ্বীন পেশ করার আগে বনু আবদুল মুত্তালিবের সামনে তিনি দস্তরখান পেশ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ তিনি জানতেন, খাবারের মধ্যে আছে এমন এক ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা, যা মানুষের হৃদয়কে বশ করে ফেলে।

চাচা আবু তালিবের ছেলে আলি তখন কিশোর। জুলফির নিচে দাড়ির রেখা ভাসতে শুরু করেছে মাত্র। নাকের নিচে উঁকিঝুঁকি মারছে শুকনো ঘাসের মতো পাতলা গোঁফ। এই বয়সি ছেলেদের কোনো শত্রু থাকে না। নবিজি আলিকে খাবারের আয়োজন করতে বললেন। বড়ো ভাইয়ের আদেশ আলি পালন করলেন হরফে হরফে। পেয়ালা ভরা দুধ আর খাসির মোটা রানে সাজালেন দস্তরখান। তারপর নবিজির নির্দেশে বনু আবদুল মুত্তালিবের সকল সদস্যকে ডাকলেন আলি। খাবারের আহ্বান উপেক্ষা করা যায় না; হোক তার আহ্বায়ক এক নওল কিশোর। আলির

দাওয়াতে বনু আবদুল মুত্তালিবের চল্লিশজন পুরুষ উপস্থিত হলেন মেজবানের বাড়িতে। এদের মধ্যে ছিলেন আবু তালিব, হামজা, আব্বাস, আবু লাহাব প্রমুখ। তারা এসে দেখলেন, মূল আয়োজক আলি নয়, মুহাম্মাদ। ভাতিজা মুহাম্মাদকে দেখে তারা কি একটু থতমত খেলেন?

আলি (রা.) আমাদের জানাচ্ছেন, ওই সামান্য খাবার—যা দিব্যি একজন লোকই খেয়ে শেষ করে ফেলতে পারে, তা চল্লিশজন পুরুষের উদরপূর্তি করেও অবশিষ্ট রইল। খাবারের এই অলৌকিকত্বে কিশোর আলি সেদিন খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। নবিজির চাচারাও কি বিস্মিত হননি? নিশ্চয় হয়েছিলেন। নয়তো পানাহার শেষে নবিজি যখন দ্বীনের দাওয়াত উপস্থাপন করতে যাবেন, ঠিক তখনই কেন আবু লাহাব হইচই করে উঠবে—এই লোক জাদু করেছে আমাদের! চলো চলো! এখানে আর এক মুহূর্ত নয়।

আবু লাহাব; সারাটা জীবন যে কিনা ভীষণ যন্ত্রণা দেবে নবিজিকে, এদিন তার ওই চিৎকার-চ্যাঁচামেচিতে লন্ডভন্ড হয়ে যায় নবিজির বহু তদবিরের ফসল গোছানো পরিবেশ। লোকেরা দাড়িতে ভেজা হাত মুছতে মুছতে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বেরিয়ে যায় বাইরে। চাচা আবু লাহাবের চক্রান্তে ভেস্তে যায় নবিজির সকল পরিকল্পনা।

পরদিন আবার খাবারের আয়োজন করেন নবিজি। এদিন খাওয়ার পাঠ চুকলে বড়ো দরদ নিয়ে কথা বলতে শুরু করেন তিনি। নবিজির ওই দরদি কথামালা ইতিহাস তার বুকের পাঁজরে স্বর্ণের অক্ষরে লিখে রেখেছে। নবিজি বললেন, হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ! আমার চেয়ে মহৎ কোনো বাণী নিয়ে এই জাতির কাছে আর কেউ এসেছে বলে আমার জানা নেই। আমি আপনাদের জন্য ইহলোক ও পরলোকের সর্বোত্তম বস্তু নিয়ে এসেছি। আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাদের তাঁর পথের দিকে আহ্বান করি। আমার ভাই বলুন, স্বজন বলুন, উত্তরাধিকারী বলুন—সকলে এখানে উপস্থিত আছেন। এখন বলুন, আমার এই ঐশী কাজে আপনারা কে কে আমাকে সাহায্য করবেন?

নবুয়তের আগের প্রজ্ঞা

নবিজির প্রজ্ঞার আলো ওহিপ্রাপ্তির পরেই কেবল জগৎকে আলোকিত করেনি; বরং নবুয়তের আগে থেকেই তাঁর মেধার সৌরভে মক্কাবাসী সুরভিত হয়েছিল। নবি হওয়ার আগে মক্কায় তিনি যে জীবন কাটিয়েছিলেন, তা যেকোনো যুবকের জন্যই ছিল পরম প্রার্থিত ও ঈর্ষণীয়। কৈশোর পর্যন্ত তাঁর অনন্য গুণাবলি আপন গোত্রের মাঝে গণ্ডিবদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু শরীর থেকে কৈশোরের পালক ঝরার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, উত্তম আখলাকের মতো দুর্লভ গুণাবলি তাঁকে পুরো মক্কা নগরীতে বিখ্যাত করে তোলে। তিনি পরিণত হন সব শ্রেণি-পেশার মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে।

নবিজির একুশ বছর বয়সের একটি ঘটনা মক্কায় বেশ তোলপাড় তুলেছিল। মক্কার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আস ইবনে ওয়েল এক ইয়েমেনি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বাকিতে পণ্য কিনে দাম শোধ করতে গড়িমসি করে। বাধ্য হয়ে সেই ইয়েমেনি ব্যবসায়ী মক্কার নেতাদের কাছে এই জুলুমের প্রতিকার চায়। আস ইবনে ওয়েলের এই অপকর্ম মক্কার ব্যাবসানির্ভর অর্থনীতির গায়ে কালিমা লেপন করে। মক্কার বয়োজ্যেষ্ঠ নেতারা এই অপকর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। কেননা, বছরে অন্তত দুইবার তাদের সিরিয়া-ইয়েমেনে বাণিজ্য করতে যেতে হয়। এই জুলুমের প্রতিবিধান না হলে মক্কার অর্থনীতি ঝুঁকির মধ্যে পড়বে, বাইরের ব্যবসায়ীরা মক্কা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। এ কারণে মক্কার বয়োজ্যেষ্ঠ গোত্রপতিরা হিলফুল ফুজুল নামে প্রণয়ন করেন সমাজের বুকে ছাপ রেখে যাওয়া এক গুরুত্বপূর্ণ শান্তিচুক্তি। যাতে বহিরাগতদের স্বার্থ ও মজলুমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। বিশিষ্ট গোত্রপতি আবদুল্লাহ ইবনে জুদানের বাড়িতে প্রণীত হয় এই চুক্তিনামা। একুশ বছরের তরুণ মুহাম্মাদ ছিলেন এই শান্তিচুক্তির উদগ্র সমর্থক। সরদার ইবনে জুদানের বাড়িতে উপস্থিত থেকে সেদিন তিনি মজলুমের পক্ষে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছিলেন। জাহেলিয়াতের নিবিড় ঘন তিমিরতার ভেতর ঝলসে ওঠা ইনসাফের এই ব্যতিক্রমী আলোটুকু এতটাই উজ্জীবিত করেছিল নবিজিকে, সেই আলোর স্মৃতি কোনোদিন তিনি ভুলতে পারেননি। বহু বছর পর যখনই সুযোগ পেয়েছেন, স্মৃতিচারণ করেছেন রক্তে নাচন তোলা ঐতিহাসিক সেই মুহূর্তটির : আবদুল্লাহ জুদানের বাড়িতে একটি চুক্তিতে আমি সাক্ষী ছিলাম। ইসলামের সময়ও যদি আমাকে এই চুক্তিতে ডাকা হতো, আমি সাড়া দিতাম।

ইসলামের আগেও নবিজি কতটা অভিজাত, আকর্ষণীয় ও ঈপ্সিত জীবন পার করেছেন, তার নমুনা পাওয়া যায় মক্কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী ব্যবসায়ী খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদের একটি সিদ্ধান্ত থেকে। খাদিজা (রা.) ছিলেন তৎকালীন মক্কার বনেদি বংশের ধনবতী রূপসি নারী। যাকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়া ছিল যেকোনো পুরুষের জন্য পরম ঈপ্সার ব্যাপার। খাদিজাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতে খোদ আবু জাহেল পর্যন্ত লালায়িত ছিল! বহু পুরুষের স্বপ্নের রানি সেই খাদিজা যখন উপযাচক হয়ে চাচার ঘরে পালিত এতিম যুবক মুহাম্মাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান, তখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়—নবিজি কতটা বাঞ্ছিত পুরুষ ছিলেন। তাঁর জীবন কতটা আকর্ষণীয় ছিল। তাঁর অবস্থান কতটা গ্রহণযোগ্য ছিল।

খাদিজা (রা.)-এর সঙ্গে নবিজির বিয়ের সেতুবন্ধন ছিল ব্যাবসা। খাদিজার হয়ে সিরিয়ায় ব্যাবসা করতে গিয়ে নবিজি অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেন। আর তারপরই নবিজির প্রতি দুর্দম্য আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করেন খাদিজা (রা.)।

হিলফুল ফুজুলে অংশগ্রহণ, ব্যাবসার সাফল্য—সবকিছুর ভেতর আমরা নবিজির বুদ্ধিমত্তার নমুনা দেখতে পাই। তবে নবুয়তের আগে, মক্কার জীবনে নবিজি সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন তখন, যখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ। সে বছর মক্কায় ভয়াবহ এক বন্যা হয়। সেই বন্যায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কাবাঘরের দেয়াল। সেকালে কাবাঘরের ওপরে কোনো ছাদ ছিল না। এর উচ্চতা ছিল আবার মাত্র নয় হাত, ইসমাইল (আ.)-এর আমল থেকে। খোলা ছাদের সুযোগে কাবাঘরে উৎসর্গিত মানতকারীদের স্বর্ণালংকার প্রায়ই চুরি হয়ে যেত। ফলে কাবাঘর সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিলো ভীষণভাবে।

নবিজির রাজনৈতিক প্রজ্ঞা

এক

ইয়াসরিবে হিজরতের পর সম্পূর্ণ নতুন এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেন নবিজি। মক্কার জীবন ছিল এক রকম, ইয়াসরিবের অন্য রকম। ইয়াসরিবের জনগণ, পরিবেশ, আবহাওয়া ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে মক্কার কোনোই মিল নেই। ইয়াসরিবের জনগণের অনুরোধেই তিনি এখানে এসেছেন, কিন্তু এখানে তাঁর অনুরাগী বা অনুসারীই শুধু নেই, আছে শত্রুপক্ষও। আছে ইহুদি, আছে মুশরিক। অচিরেই মুনাফিকদেরও আবির্ভাব ঘটে যাবে।

হিজরতের আগে তিনি কথা দিয়েছিলেন—ইয়াসরিবের যুদ্ধের আগুন তিনি নেভাবেন। এই আগুন নেভাতে হলে সবার আগে সাম্য ও সম্প্রীতির সমাজ গড়তে হবে। দূর করতে হবে গোত্রীয় বিভেদ ও বিদ্বেষ। লোকদের আশ্বস্ত করার জন্য তিনি ঘোষণা দিলেন—আল্লাহ মক্কাকে হারাম করেছেন, আমি হারাম করলাম মদিনাকে। অর্থাৎ মক্কায় যেমন রক্তপাত নিষিদ্ধ, মদিনাকেও নবিজি সেই কাতারে উন্নীত করলেন। যেন এর অধিবাসীরা স্বস্তি ও শান্তিতে থাকতে পারে। আস্থা রাখতে পারে তাদের নতুন নেতৃত্বের ওপর। যদিও এই আস্থা ও বিশ্বাস নির্বিশেষে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া বেশ কঠিন। কারণ, এখানে যেমন সরলমনা মানুষ আছে, আছে হৃদয়ে কুটিলতা ধারণকারী কুৎসিত মানুষও। তিনি জেনেছেন, তাঁর আগমনের আগে আউস-খাজরাজের লোকেরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নামের এক ব্যক্তিকে ইয়াসরিবের নেতা মনোনীত করতে ঐকমত্য হয়েছিল; বাকি ছিল শুধু আনুষ্ঠানিকতা। তারপর তো অবস্থা বদলে গেল। নবিজির আগমনের প্রেক্ষাপট তৈরি হলো। এরপর ইয়াসরিবের মুসলিম সম্প্রদায় নবিজির মস্তকে নেতৃত্বের মুকুট পরিয়ে দিলো। বঞ্চিত হলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। লোকটাকে দেখেছেন নবিজি। যার কারণে তার নেতৃত্বের দুধবাটি ধুলোয় গড়িয়ে পড়ল, সে কি মেনে নেবে সেই নবিকে! নবিজির আগমনের পর লোকেরা ইয়াসরিবকে মদিনাতুন নবি বা নবির শহর বলে সম্বোধন করছে, এই পরিবর্তনই তো সে মানতে পারছে না; নবিকে কীভাবে মানবে! আবদুল্লাহ ইবনে উবাই জীবনভর জ্বালাবে নবিজিকে। ছদ্মবেশে থেকে সে ক্রমাগত কাটতে থাকবে ইসলামের শান্তির শেকড়। সাহাবিদের ঐক্যের তাসবিহকে খণ্ডবিখণ্ড করতে সে উৎসর্গ করবে জীবন। তার এই বিরোধিতার বীজ কি বপিত হয়েছিল হাতছাড়া হওয়া নেতৃত্বের ক্ষোভের ভেতর?

নবিজি প্রথমে চাইলেন মুসলিমদের ঐক্য। মক্কায় যারা ঈমান এনেছিল, তাঁরা সকলে ছিল একই অঞ্চলের, একই বংশজাত, বৃহত্তর কুরাইশের সন্তান। তারচেয়ে বড়ো কথা—তাঁরা সকলে ছিল মজলুম। আর এটা ধ্রুব সত্য যে, অত্যাচার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। কিন্তু মদিনার অবস্থা ভিন্ন। এখানকার মুসলিমরা স্থানীয় ও বহিরাগত বা আনসার-মুহাজির দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। আনসারদের ঘরবাড়ি, স্ত্রী-সন্তান, সম্পদ সবই আছে। কিন্তু মুহাজিরদের বলতে গেলেই কিছুই নেই। এমতাবস্থায় দুই শ্রেণিকে আনতে হবে একই সমতলে। নয়তো কুরআনভিত্তিক ইনসাফের সমাজ নির্মাণ অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং এই কাজটাই নবিজি করতে লাগলেন মদিনায় পা রাখার পরপরই।

শুরুতেই তিনি মুহাজির-আনসারদের সঙ্গে নিয়ে নির্মাণ করলেন মদিনার প্রথম ইবাদতখানা মসজিদে নববি। মুসলমানদের মিলনমেলা। যেটা একই সাথে হবে মুসলিম সম্প্রদায়ের পরামর্শগৃহও। মদিনায় প্রবেশের পর যে স্থানে নবিজির উটনী বসেছিল, সেই জায়গাটা নির্বাচন করা হলো মসজিদের জন্য। জায়গাটার মালিক ছিল দুজন এতিম বালক। নবিজি তাঁদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে জায়গাটা ক্রয় করে নিজেই হাত লাগালেন নির্মাণকাজে। তিনি কাদা ছানছেন, ইট বানাচ্ছেন, কাঁধে পাথর বইছেন, ছাদের জন্য খেজুরের ডাল কাটছেন, খেজুরের সুচালো পাতায় রক্তাক্ত হচ্ছে তাঁর শরীর—এমন সরল ও মায়াবী হৃদয় নিয়ে কবে আর কোন নেতা এসেছিল বসুন্ধরায়? শুধু কি তা-ই? সাথিদের উদ্‌বুদ্ধ করতে তিনি ইট-পাথর বহন করছিলেন আর আবৃত্তি করছিলেন এক চমৎকার কবিতা—

হে আল্লাহ! পরকালের জীবনই আসল জীবন। তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করো।

এটা খায়বারের বোঝা নয়। এটা আমাদের রবের পক্ষ থেকে পুণ্যময় ও পবিত্র কাজ।

নবিজির রণকৌশল

সংসার থেকে রাষ্ট্র, মসজিদ থেকে রণাঙ্গন—সকল ক্ষেত্রেই নবিজি ছিলেন সফল সংগঠক, বিচক্ষণ পরিচালক। বিশেষত আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগে যুদ্ধের ময়দানে তিনি এমন রণকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, যা পর্যালোচনা করতে গিয়ে এই আধুনিক সময়ের যোদ্ধা ও বোদ্ধাগণ অবাক হয়ে যায়। মানুষের জীবনে যুদ্ধের ময়দান সবচেয়ে নির্মম, কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনের অন্যান্য জায়গায় অকৃতকার্য হলেও মানুষ প্রাণে বেঁচে ফেরে, নতুন করে শুরু করার সুযোগ থাকে, কিন্তু যুদ্ধ এমন এক কঠিন বাস্তবতা, যেখানে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিলে মানুষের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যায়। শুধু মানুষ বলি কেন? সম্ভ্রম, সার্বভৌমত্ব এমনকি রাষ্ট্রও বিলুপ্ত হয়ে যায়। বদলে যায় মানচিত্রের গতি-প্রকৃতি। আর এ কারণেই আমাদের নবিজি সবচেয়ে বেশি সতর্ক ছিলেন রণাঙ্গনে। সবচেয়ে বেশি সজাগ ছিলেন রণক্ষেত্রে। সবচেয়ে বেশি মেধা খাটিয়েছেন যুদ্ধ পরিকল্পনায়। এবং এই কর্মপন্থায় তিনি শতভাগ সফল হয়েছেন। নতুন এই অধ্যায়ে আমরা নবিজির রণাঙ্গনের বুদ্ধিমত্তার গল্প বলব।

এক

মরুভূমির রুক্ষ বুকে এলোমেলো চিহ্ন এঁকে এগিয়ে যাচ্ছে ছয়টি উট। উটের পিঠে সটান হয়ে বসে আছে ছয়জন অকুতোভয় যোদ্ধা। উটের রশি ধরে এগিয়ে যাচ্ছে আরও ছয়জন সহকর্মী। প্রত্যেকের কোমরে ঝুলছে খাপবদ্ধ তরবারি। গায়ে মেটে রঙের ঢোলা জামা। চেহারায় পাথরের কাঠিন্য। দাড়িতে সফরের শুভ্রতা। হঠাৎ লুহাওয়া বইতে শুরু করলে তাঁরা মুখে প্যাঁচিয়ে নিলেন মোটা কাপড়ের রুমাল। দলটির প্রধান আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আফসোস করে বললে, ইস! আমাদের যদি ঘোড়া থাকত! এতক্ষণে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারতাম।

ইবনে জাহাশের এক সঙ্গী বলল, আপনি ঘোড়ার জন্য আফসোস করছেন অথচ আমাদের প্রত্যেকের উটও নেই। ছয়টি উট বারোজনে ভাগ করে চলতে হচ্ছে।

আল্লাহ নিশ্চয় আমাদের অমিত তেজি ঘোড়ার মালিকও বানাবেন। দলপতি আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ জেবের ওপর আত্মবিশ্বাসী হাত রাখলেন। জেবের ভেতর নবিজির লেফাফাবদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ একটি চিঠির অস্তিত্ব অনুভব করলেন তিনি। নবিজির স্পষ্ট নির্দেশ—দুই দিনের আগে খোলা যাবে না চিঠিটি। দুই দিন সফর করার পর খুলতে হবে এই চিঠি। তারপরই পাওয়া যাবে নতুন নির্দেশনা। লুহাওয়ার ভেতর নবিজির ভরাট কণ্ঠস্বরের ওই নির্দেশ নতুন করে শুনতে পেলেন ইবনে জাহাশ। অমনি চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল তাঁর। চিঠিটির কথা যতবার মনে পড়ছে, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছেন।

বারোজনের ছোট্ট একটি কাফেলা, সকলেই বিশ্বস্ত, নবিজির জন্য উৎসর্গিত সকলের প্রাণ, তারপরও এত সতর্কতা!

মদিনা সনদের পর সবকিছু ভোজবাজির মতো বদলে গেছে। মদিনাকে ঘিরে নবিজি এমন সব তৎপরতা শুরু করেছেন, মক্কায় যা কল্পনাও করা যেত না। মক্কার ইসলাম ছিল ব্যক্তিক ইসলাম। সেখানে ব্যক্তির ভেতর ইসলামের চর্চা হলেই তাকে চূড়ান্ত সাফল্য ধরা হতো। মদিনায় এসে ইসলাম রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করেছে। এখানে ইসলামের অস্তিত্ব জড়িয়ে গেছে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সঙ্গে। তাইতো নবিজির এখনকার পদক্ষেপগুলো ব্যক্তিগত নয়; বরং রাষ্ট্রগত।

নবিজি বহু আগেই বুঝে গেছেন, আল্লাহ যে মহান দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, এই দায়িত্ব পালন করতে গেলে পদে পদে তাঁকে বাধার সম্মুখীন হতে হবে। এই পৃথিবীতে কিছু মানুষ যেমন সত্যের ধারক-বাহক হবেন, তেমনি কিছু মানুষ হবে মিথ্যার পূজারি। পৃথিবীতে যখনই কোনো মুসা আসেন, ঠিক তখনই হকের বিপরীতে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ফেরাউনের প্রেতাত্মারা। আপাতত নবিজির কাছে মনে হচ্ছে মক্কার মুশরিকরাই ফেরাউনের সেই প্রেতাত্মা। এই নব্য ফেরাউনদের কবল থেকে ইসলামকে বাঁচাতে তৎপরতার বিকল্প নেই।

মক্কার মুশরিকদের আত্মম্ভরিতার প্রধান উৎস ধনসম্পদ। এই ধনসম্পদ তারা অর্জন করে প্রধানত সিরিয়ার বাণিজ্য থেকে। নবিজি নিজেও প্রথম স্ত্রী আম্মাজান খাদিজা (রা.)-এর ব্যবসায়ী পণ্য নিয়ে সিরিয়া সফর করেছেন। আর মুসলিমদের জন্য এটা বড়ো সুসংবাদ যে, মক্কাবাসীর সিরিয়া যাওয়ার পথ মদিনার নাকের ডগা দিয়ে। মুশরিকদের নির্বিঘ্ন সিরিয়া বাণিজ্য রোধ করতে মদিনা সনদের পরপরই নবিজি নতুন এক কর্মপন্থা তৈরি করলেন। তিনি আধুনিক সেনাপতিদের মতো বাহিনীর ভেতর গুপ্তচর নিয়োগ করলেন। এদের কাজ মদিনার নিকটবর্তী সিরিয়া-মক্কার সড়কে টহল দেওয়া। যখনই কুরাইশদের কোনো বাণিজ্যিক কাফেলা দৃষ্টিগোচর হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নবিজির কাছে খবর পৌঁছে দেন। আর নবিজি কাফিরদের বাণিজ্যিক যাত্রায় বিঘ্ন ঘটাতে পাঠিয়ে দেন ছোট্ট ছোট্ট সৈন্যদল। ইসলামের প্রথম আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ বদরের আগে এ রকম বেশ কিছু রক্তপাতহীন অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এ রকমই এক অজানা অভিযানে ছুটছে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বাধীন বারো সাহাবির কাফেলাটি।

দুই দিন পর। নবিজির গোপন চিঠির আবরণ খুললেন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ। তাতে নবিজির নতুন নির্দেশনা পাওয়া গেল। নবিজি লিখেছেন— আমার এ পত্র পাঠ করার পর তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলবে এবং মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলায় যাত্রাবিরতি করবে। সেখানে কুরাইশ বাণিজ্যিক কাফেলার জন্য ওত পেতে থাকবে। কাফেলার সন্ধান পাওয়ামাত্র তাদের অবস্থা ও অবস্থান আমাকে অবহিত করবে। আর হ্যাঁ, গোপন এই অভিযানে শুধু তাঁদেরই সঙ্গে রাখবে, যারা স্বেচ্ছায় জীবন দিতে চায়। কারও ওপর জবরদস্তি করবে না।

শিক্ষা প্রদানে নবিজির প্রজ্ঞা

এ কথা কোনো মুসলমানের কাছেই অবিদিত নয় যে, আমাদের নবিজি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন শিক্ষকতার দায়িত্ব নিয়ে। এটা খুব মজার ব্যাপার, পৃথিবীতে নবিজির কোনো শিক্ষক ছিল না; কিন্তু তিনি ছিলেন পৃথিবীবাসীর শিক্ষক। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বারবার নবিজির এই দায়িত্বের কথা আমাদের জানিয়েছেন। আবার নবিজি নিজেও নিজের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়েছেন আমাদের, যেন আমরা তাঁকে শিক্ষক মেনে তাঁর প্রতিটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। আল্লাহ সূরা জুমুআর মধ্যে উল্লেখ করেছেন—তিনি সেই সত্তা; যিনি উম্মি আরবদের ভেতর থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের কাছে তিলাওয়াত করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমা; যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তির ভেতর নিমজ্জিত ছিল।

নবিজি যে শিক্ষক হিসেবে এসেছিলেন, হাদিস থেকেও আমরা বুঝতে পারি। একদিন নবিজি মসজিদে অন্য ধরনের দৃশ্য দেখতে পেলেন—যা সচরাচর তিনি দেখেন না। তিনি দেখলেন, মসজিদের লোকজন দুই দলে ভাগ হয়ে বৃত্ত রচনা করে বসে আছে। প্রথম দল কুরআন তিলাওয়াত, জিকির ও দুআ করছে। দ্বিতীয় দল ইলম শিখছে ও শেখাচ্ছে। নবিজি ঘর থেকে মাত্রই মসজিদে ঢুকছিলেন। এই দৃশ্য দেখে তাঁদের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করলেন—উভয় দলই ভালো কাজে নিয়োজিত আছে। প্রথম দল কুরআন তিলাওয়াত, জিকির ও দুআ করছে। আল্লাহ চাইলে তাঁদের প্রতিদান দেবেন, না চাইলে দেবেন না। আর দ্বিতীয় দল শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদানে মগ্ন। আর আমি তো প্রেরিতই হয়েছি শিক্ষক হয়ে। এই বলে তিনি দ্বিতীয় দলের হালাকায় বসে গেলেন।

হাদিসের এই গল্পে আমরা দেখলাম, নবিজি নিজেকে শিক্ষক হিসেবে উপস্থাপন করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন এবং শিক্ষকদের হালাকায় বসাকে পছন্দ করেছেন। তো, নতুন এই অধ্যায়ে আমরা শিক্ষক হিসেবে নবিজি কেমন বিচক্ষণ ছিলেন, তা দেখার চেষ্টা করব। প্রিয় পাঠক! আপনি যখন এই অধ্যায়ের প্রতিটি পাতায় চোখ রাখবেন, নিশ্চিতভাবেই উপলব্ধি করবেন—শিক্ষক হিসেবেও নবিজি ছিলেন অনন্য মেধার অধিকারী, তুলনারহিত। জীবনের অন্যান্য অধ্যায়ের মতো শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও তিনি অসামান্য প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

আমরা দেখব, শিক্ষকতা বা পাঠদানের ক্ষেত্রে নবিজি বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। কখনো মনোযোগ যাচাইয়ের জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দিতেন, কখনো প্রশ্ন না ছুড়ে স্বাভাবিক উত্তর দিতেন। কখনো মুখে উত্তর দিতেন, কখনো ইশারায় বা কাজ করে দেখিয়ে দিতেন, আবার কখনো লিখিত উত্তরও দিতেন। কখনো একই কথা তিনবার বলতেন, কখনো আল্লাহর নামে শপথ করে বলতেন, আবার কখনো কথা বলার সময় হাত নাড়তেন, আঙুল দিয়ে ইশারা করতেন। মাঝে মাঝে নারীদের জন্য আলাদা মজলিশের ব্যবস্থা করে বিশেষ পাঠদান করতেন। শিশু-কিশোর-তরুণদের জন্যও ছিল তাঁর ভিন্ন পরিকল্পনা। তিনি শিশু-কিশোরদের সঙ্গে যখন কথা বলতেন, বয়স থেকে নেমে নিজেও যেন শিশু হয়ে যেতেন। এই সবই তাঁর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে।

আলোচ্য অধ্যায়কে আমরা অনেকগুলো পর্বে বিভক্ত করব। বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে প্রত্যেক পর্বে আমরা শিক্ষা প্রদানে নবিজির প্রজ্ঞার চমৎকার সব উদাহরণ তুলে আনার চেষ্টা করব। আশা করি হাদিসের পথ ধরে এগোনো আপনাদের এই ভ্রমণ সুখময় হবে।

এক

এই পর্বে আমরা নবিজির হাতেকলমে শিক্ষা প্রদানের কিছু নমুনা তুলে ধরব। এবং প্রতিটি নমুনার ভেতরেই আমরা নবিজির অপার্থিব মেধার সৌরভ উছলে উঠতে দেখব। এতে নবিজির প্রতি আমাদের ঈমান ও ভালোবাসা আরও বেড়ে যাবে।

একবার এক সাহাবি এলেন নামাজের ওয়াক্ত জানতে—কোন নামাজ কোন সময়ে পড়তে হয় নিখুঁতভাবে তাঁর জানার ইচ্ছা। সাহাবিকে নবিজি মৌখিক উত্তর দিলেন না। যেতেও দিলেন না সেদিন। নিজের কাছে রেখে দিলেন দুই দিন। এই দুই দিন ধরে চলবে তাঁর হাতেকলমে পাঠদান। নবিজি বললেন, দুই দিন আমাদের সঙ্গে নামাজ পড়ো, তবেই সব বুঝে যাবে। নবিজির এই নির্দেশ দ্বারা বোঝা যায়, সাহাবির বাড়ি ছিল মদিনার বাইরে। নয়তো তাঁর এমনিতেই নবিজির মসজিদে নামাজ পড়ার কথা।

প্রথম দিন দুপুরে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লে নবিজি বিলালকে জোহরের আজান দিতে বললেন। বিলাল আজান দিলেন। তাঁর ইকামতে নামাজ হলো জোহরের। এরপর নবিজি আবার আজান দিতে বললেন বিলালকে। সূর্য তখনও বেশ ওপরে এবং সূর্যের শরীর ঝলমল করছে আলোয়। বিলাল আজান দিলেন। এই আজান আসরের। সাহাবিগণ বিলালের আজান-ইকামতে আসরের নামাজ পড়লেন নবিজির পেছনে। সূর্য যখন ডুবে গেল, নবিজি মাগরিবের আজানের আদেশ দিলেন। তারপর সবাইকে নিয়ে তিনি মাগরিবের নামাজ পড়লেন। খানিক পর আকাশ থেকে যখন সূর্যাস্তের লাল আভা দূর হয়ে গেল, নবিজি এবার আদেশ করলেন ইশার আজান দিতে। বিলাল আজান দিলেন। সেই সাহাবিসহ সকলে ইশার নামাজ পড়লেন। ইশার নামাজ শেষে রাতের অন্ধকার ছেয়ে ফেলল মদিনাকে। মুসলিম জনপদ ঘুমিয়ে পড়ল। প্রশ্নকর্তা সাহাবিও ঘুমালেন মসজিদের

আশেপাশে কারও বাড়িতে। আরামদায়ক নিদ্রা শেষে এরপর যখন সুবহে সাদিক উদিত হলো, নবিজি আদেশ করলেন ফজরের আজান দিতে। বিলাল আজান দিলেন। চরাচরে অন্ধকার থাকতেই নবিজি ফজরের নামাজ পড়লেন।

এভাবেই অতিবাহিত হলো প্রথম দিন। দ্বিতীয় দিনে নবিজি জোহরের নামাজ পড়লেন বেশ দেরিতে, রোদের তাপ ও তীব্রতা আরামদায়ক হওয়ার পর। আসরের নামাজও পড়লেন আগের দিনের তুলনায় দেরিতে; সূর্যের গায়ে লাল কমলা ধরার কিছুটা পূর্বে। আর মাগরিব পড়লেন রক্তিম আভা ডুবে যাওয়ার খানিক আগে। ইশা পড়লেন রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর। আর ফজর পড়লেন তখন, যখন পূর্ব দিগন্ত পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। এরপর নবিজি উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, নামাজের ওয়াক্ত জানতে চাওয়া সেই প্রশ্নকর্তা কোথায়?

সাহাবি এগিয়ে এসে নরম কণ্ঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই তো আমি।

নবিজি বললেন, গত দুই দিনে যে দুই সময়ে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজ পড়া হয়েছে, এই দুই সময়ের মাঝে হলো তোমাদের জন্য সেই ওয়াক্তের নামাজ।